শিল্পে প্রতীক

সুদত্তা রায়চৌধুরী

প্রতীকের ইতিহাসে দেখা যায়, সব কিছুকেই প্রতীকী তাৎপর্যের মধ্যে আনা হয়েছে। প্রতীক হল, কোনও বস্তু বা কোনও ধ্যান ধারণাকে অন্য মাত্রায় প্রকাশ। যেমন গাছপালা জীবজন্তু মানুষ পর্বত উপত্যকা সূর্য চন্দ্র বাতাস জল ও আগুন --- সবই হল প্রাকৃতিক বস্তু। অনুরূপভাবে মনুষ্যসৃষ্ট বস্তুগুলো হল, বাড়িঘর নৌকা যানবাহন কিংবা বিমূর্ত বিষয়ক যেমন সংখ্যা ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গোলাকৃতি প্রভৃতি জ্যামিতিক পরিসীমাগুলো। সেই আদিমকাল থেকেই মানুষ তার অভ্যাস থেকে অবচেতনে প্রতীকের রূপ পরিবর্তন করে আসছে। সেইসঙ্গে এই সমস্তঅদ্ভুত প্রতীকের ওপর প্রভূতপরিমাণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিয়ে এসেছে মানুষ। এই কারণেই মানুষের সমস্ত সৃষ্টিশীল ও মননশীল প্রক্রিয়া বা মাধ্যমে আমরা এর প্রভাব লক্ষ্য করি। কারণ আমরা জানি যে গান নাচ আঁকা লেখা এগুলো মানুষের মনোবৃত্তির অন্তর্গত, তাই তাতে মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার যে প্রতিফলন পড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভীত হয়ে খুঁজতে চেয়েছে শক্তির কোনও আধার, আর সেই আধারের প্রয়োজনেই এসেছে প্রতীক, এসেছে যাদুবিদ্যাও। বিমূর্ত এই ধারণা ক্রমে ক্রমে পরিণত হয়েছে ধর্মে। তাই ধর্মেও কিছু কিছু প্রতীকের প্রতিচ্ছবি দেখি। ধর্ম ও শিল্পের মিলিত ইতিহাসে, বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক সময়ে আমাদের পূর্বপুষেরা যেসব প্রতীক রেখে গেছে, সেগুলো জীবনে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এমনকি বর্তমানে আধুনিক চিত্র ও ভাস্কর্যেও এই ধর্ম ও শিল্পের মিলিত সত্তা দেখা যায়।

আমরা জানি, অমসৃণ পাথরখন্ড প্রাচীনকালে এবং আদিম সমাজে যথেষ্ট প্রকৃতি মধ্যস্থতা পেত। স্বাভাবিকভাবেই এই অমসৃণ ও প্রাকৃতিক পাথরগুলিকে আদিম মানুষ মনে করত ভগবান বা অশরীরী সত্তার আবাসস্থল। সেজন্য এগুলো আদিম সমাজের ধর্মীয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হত, আর এই ব্যবহারকে তখন মনে করা হত যে সেগুলো আদিম ভাস্কর্য অর্থাৎ এগুলো হল ‘Sacred stone symbol’ ।

আদিম প্রস্তর অধ্যুষিত অনেক স্থানে একটিমাত্র প্রস্তরই দেবতার প্রতীকী হয়ে উঠতোনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইউরোপের ব্রিটানিতে জ্যামিতিক প্রস্তর ও প্রস্তরবৃত্ত। অন্যদিকে জৈন- বৌদ্ধধর্মে প্রস্তর বাগিচায় এগুলিকে যথেষ্ট গুত্ব দেওয়া হত।। ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে মানুষ নিজের অন্তর দিয়ে বোধ করতে পেরেছিল প্রস্তর সত্তাকে, তাকে একটা নির্দিষ্ট রূপে রূপায়িত করত। অনেক ক্ষেত্রেই এই রূপায়িত রূপ নির্দিষ্ট মনুষ্যমূর্তির কাছাকাছি ধরা হত। উদাহরণ স্বরূপ Mehheris এমন একটি প্রস্তর নির্মিত বস্তু, যা তার ক্ষ বহিঃরেখার কারণে মুখমন্ডলের আকারে প্রকাশিত হয়। অনেক আদিম সমাজে প্রস্তরকে মানুষ্যমূর্তির পে দেবত্ব আরোপ করা হত। অর্থাৎ অবচেতন ভাবেপ্রস্তরের মধ্যে জীবত্বভাব আনার প্রচেষ্টা ওই সময়ে দেখা গিয়েছিল। আধুনিক অনেক ভাস্কর্যতেই দেখা যায় যে প্রস্তরের সহজাত রূপটিকে ধরে রাখা হয়েছে, শুধুমাত্র মানুষের মূর্তির সম্বন্ধেএকটা আভাস দেওয়ার জন্য, যে ধারণটি উদ্ভুত হয়েছিল আদিম কালে। বর্তমানে অনেক শিল্পীর কাজে দেখা যায়, বস্তুর সহজাত রূপটিকে প্রতীকী ব্যাখ্যায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে। জার্মানির ভাস্কর ম্যাক্স আর্নস্ট আমেরিকার জেম রোসেটির কাজে এধরণের চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়

আর এক ধরনের প্রতীক আমরা চিত্রে বা ভাস্কর্যে প্রভূত পরিমাণে পাই। তা হল প্রাণীর প্রতীক -- animal symbol. তুষার যুগ থেকে অর্থাৎ প্রায় ৬০,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত আমরা ওইরূপ প্রাণীদের ছবি পাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু প্রাণীদের শরীর দেখা গেছে ফ্রান্স ও স্পেনের গুহার দেওয়ালে, যাআবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র গত শতাব্দীর শেষে।। এমনকি বর্তমানেও যে সব গুহাতে পাহাড় খোদাইও চিত্র দেখা যায়,সেই

চিত্রের প্রতি মানুষের এক অদ্ভুত যাদুকরী চেতনা বিদ্যমান। এক বিখ্যাত জার্মানি শিল্প ঐতিহাসিকের মতে Õাফ্রিকা স্পেন ফ্রান্স স্ক্যানডিনেভিয়া যেখানেই গুহাহিত্র দেখা গেছে. সে সকল স্থানে আদিবাসীদের গুহার কাছে যেতেদেখা য ায় না। সম্ভবত এক ধরনের ধর্মভীতা বা কোনও এক ভীতি যা এই গুহাচিত্র সম্পর্কে মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তাই ম ানুষ ভীত হয়ে পড়ে।

উত্তর আফ্রিকার পুরাতন এক গুহাচিত্রে Ëদখা যায় যে, বেদুইনরা Votine অর্পন করছে। অর্থাৎ এর থেকে প্রমানিত হয় যে, এই গুহার কাছাকাছি এসে তারা কোনও না কোনও বস্তু অর্পন করত কোনও অশরীরী আত্মার বা শক্তির উদ্দেশ্যে। এমনকি পঞ্চাদশ শতকে কোন একজন পোপ, যে গুহায় ঘোড়ার ছবি আছে যেখানে কোন ধর্মীয় উৎসব নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই দুটি উদাহরণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, গুহাপ্রস্তরের গায়ে যে - জীবজন্তুর ছবি আঁকা আছে, যা দেখে মানুষের ভীতির সঞ্চার হয়েছে, সেগুলিকে তারা ধর্মস্থান হিসেবে চিহিত করেছে। অর্থাৎ ওই জীবজন্তুর ছবিগুলি তাদের কাছে অশুভ বা ভীতিকর শক্তির প্রতীক। প্রস্তর যুগেও আমরা প্রাণীর গুহাচিত্র পাই এবং এসব প্রাণীদের গতিকেও অত্যন্ত শৈল্পিক মন নিয়ে অঙ্গিত করেছিল তারা। এসব চিত্রে দেখা যেত যে, প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাণীকে যেভাবে দেখা যায়, তাকে হুবহু চিত্রিত করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আদিম চিত্রগুলির প্র াণীদের চিত্রিত করা হত, তাদের শিকার করার উদ্দেশ্যে। এরকম একটি গুহায় একটি ঘোড়ার চিত্র দেখা যায়, যাদের একটি শিকারীর ফাঁদে ফেলা হয়েছে। এখানে এই ছবিটির দুটি সত্তা বর্তমান। প্রথমত, প্রতীকীভাবে শিকারী মনে করে যে ওই প্রাণীর মৃত্যু সংঘটিত হল এবং এও এক ধরনের sympatheticmagic হিসাবে চলে আসছে। অর্থাৎ ছবিতে যেটি দেখানো হল বাস্তবেও সেটি ঘটানোর ইচছা থাকছে বা বাস্তবেও সেটি ঘটানো হল।এ সমস্ত চিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে সত্তাটি দেখা যায়, তা হল, জীবন্ত ব্যক্তির সঙ্গে চিত্রের অঙ্কিত ব্যক্তির সহমর্মিতা।
অন্যান্য গুহাচিত্রের ছবিগুলি গর্ভদান (fertility) প্রসঙ্গে অঙ্কিত করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই ধরনের ছবি গুলিতে দেখা যায় যে, প্রাণীরা পরস্পর মিলিত হচেছ। ফ্রান্সের একটি গুহায় এরকম একটি চিত্রে পুষ ও মহিলা ব াইসনকে মিলিত হতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই ছবিটির মাধ্যমে প্রকৃতির এক যাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হয়। অপর একটি গুহাচিত্রে দেখা যায় যে, অর্ধেক মানুষ যা প্রাণীর ছদ্মবেশে অঙ্কিত এবং যারা চারপাশে প্রাণীরা ঘুরে বেড়াচেছ। আবার অন্য কোনও চিত্রে দেখা যায় যে, মানুষ প্রাণীর চামড়ায় আবৃত হয়ে আদিম বাঁশি বাজাচেছ, চারপাশে অনেক জীবজন্তু অর্থাৎ ওই সব জীবজন্তুদের বাঁশীর সাহায্যে বশ করার চেষ্টা দেখা যায়। ওই একই গুহায় একটি নৃত্যরত মানুষকে দেখা যায়, যার মাথাটা ঘোড়ার মতো। এই জন্তুটি আর সমস্ত জীবজন্তুদের মধ্যে একজন লর্ড হিসাবে চিহিত। আফ্রিক ার আদিম উপজাতিদের প্রথা অধ্যয়ন করে দেখা যায় যে, এই প্রতীকী মূর্তিগুলি এক রহস্যজনক বিষয়ে আলোকপাত করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সব উপজাতি অধ্যুষিত সমাজের রাজতন্ত্রের ধারণাটি প্রাণীদের ছদ্মবেশে দেখানো হয়েছে। এজন্য রাজা ও প্রধানকে জীবজন্তু বলে ধরে নেওয়া হয়, তারা সিংহ বা লেপার্ড হিসাবে পরিচিত। আফ্রিকার কোনও কোনও সম্রাটের উপাধির মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষনীয়। যেমন ইথিওপিয়ার রাজাকে বলা হয় Haileselassi Judd. ‘Judd’ মানে এখানে সিংহ। পরবর্তীকালে এই প্রাণীর ছদ্মবেশই প্রাণীর
মুখোশে পরিবর্তিত হয়। আদিম মানুষেরা নিজেদের সমস্ত শিল্পকৌশল দিয়ে মুখোশ তৈরি করত। তাদের কাছে এ সমস্তই ছিল শক্তির প্রতীক। এছাড়াও কোনও কোনও মুখোশ দেবতা বা দানবের প্রতীক হিসাবে শ্রদ্ধেয় হত। মনস্তা ত্বিক দিক দিয়ে বলা যায়, মুখোশ প্রকৃতপক্ষে মুখোশধারীর নিজের মূর্তির পরিবর্তন করতে সাহায্য করে এবং একই সঙ্গে মুখোশধারী মনে করে যে সে ওই মুখোশের প্রকৃত অধিকারী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগকে পিছনে ফেলে ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখা যায়, অনেক দেশের পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে আ দিম জন্তু জানোয়ারদের সম্পর্ক। বলা বাহুল্য এ সমস্তসম্পর্কই মানুষের উৎপাদনশীলতার প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত।যেমন পারস্যদেশীয় সূর্য মিথ্রা (Mithra) সংক্রান্ত চিত্রে দেখা যায় যে, দেবতার উদ্দেশ্যে একটা ষাঁড়কে বলি দেওয়া হচেছ এবং এই বলি থেকে সৃষ্ট হচেছ পৃথিবী এবং তার ধন ঐর্য প্রভৃতি। অন্যদিকে খ্রিস্টিয় পৌরাণিক কাহিনি সেন্ট জর্জ - এ

দেখা যায়, একটি ড্রাগনকে হত্যা করা হচ্ছে, যার প্রতীক হচ্ছে আদিম আহুতি দানের সৃষ্টি। ধর্ম ও ধর্মীয় শিল্পে প্রতিটি দেশই জীবজন্তুকে দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে অথবা দেবতাদের তৈরিকরা হয়েছে জীবজন্তুর মূর্তির মাধ্যমে। প্রাচীন ব্যাবিলনবাসীগণ তাদের স্বর্গের দেবতাকে ভেড়া বৃষ কাঁকড়া সিংহ কাঁকড়াবিছে মাছের প্রতীকে রূপায়িত করেছে ও সেগুলিকে দিয়ে Zodiac Symbol সৃষ্টি করেছে। মিশরীয়রা দেবী হ্যাপরকে গ - মাথাযুক্ত করে দেখিয়েছে। দেবতা আমনকে ভেড়ারূপী, Thoth কে পাখিরূপী অথবা বেবুনমুখী করেছে। আবার হিন্দু দেবতা গনেশের ক্ষেত্রে দেখা য ায়, মানুষের দেহ কিন্তু মাথাটা হাতির। বিষ্ণুকে বরাহমুখী, হনুমানকে দৈত্যরূপী। কোনও কোনও পশুকে তো দেবতার ওপরেই স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন হস্তী সিংহ প্রভৃতি। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনিতে জীবজন্তুর অনেক কাহিনি পাওয়া য ায়, যা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। জিয়াস (Zews,) দেবতাদের পিতা, কখনও কখনও একটি বালিকাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করেন এবং তখনই একটি হাঁসের বা বৃক্ষ বা ঈগলের আকার ধারণ করেন। খ্রিস্টধর্মেও জীবজন্তুর প্রতীক গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনজন খ্রিস্টধর্মের প্রচারককে জন্তুর প্রতীকীতে দেখা যায়। যেমন সেন্ট লুই ষাঁড়, সেন্ট মার্ক সিংহ ও সেন্ট জন ঈগলের ছদ্মবেশে। সেন্ট ম্যাথু কখনও মানুষের বেশে, কবনও বা দেবদূতের বেশে আবির্ভূত হয়েছেন। পরমপিতা যিশু নিজেই এসেছেন ভেড়ার রূপ ধরে, কখনও বা মৎস্যরূপী হয়ে। কখনও আবার ত্রশের উপর সরীসৃপ আকারে বা এক সিং-যুক্ত জীব হিসাবে। এই সমস্ত প্রতীকী তাৎপর্যের ব্যাখ্যা করে বলা যায়, জেসাস তঁ ার প্রাণীজ গুণাবলী পরিত্যাগ করে হয়ে উঠেছেন আধ্যাত্মরূপী পরমপুষ। এই সব প্রতীকের মাধ্যমে অন্ত্যজ মনুষ্যত্ব এবং অধ্যাত্ম মনুষ্যত্ব, যা প্রকৃতপক্ষে দেবত্বে পরিণত হয়, এ দুয়ের সম্বন্ধখুব সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে রূপকের অ াড়ালে।

সর্বকালের ধর্ম ও শিল্পে পশু প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। তা দিয়ে শুধুমাত্র প্রতীকের গুত্ব বোঝানো হয়নি। জীবনের ক্ষেত্রে প্রতীকের অন্তর্নিহিত সত্তা হল প্রবৃত্তি, তাকেও বোঝানো হয়েছে। পশু প্রতীকের ক্ষেত্রে পশুকে ভালো বা দুষ্ট কে ানওভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না, কারন পশু হচ্ছে প্রকৃতিরই অঙ্গ অর্থাৎ প্রবৃত্তি। এবং এই প্রবৃত্তি অবশ্যই আমাদের ক াছে রহস্যময়। কেননা, এই প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতির প্রকৃত সত্তা। তবে মানুষের মধ্যে পশুশক্তি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, যদি না তাকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় এবং মানুষই হচ্ছে একমাত্র জীব যে অবশ্যই তার প্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারে। কিন্তু একইসঙ্গে এই প্রবৃত্তি বিকৃত হয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ও মানুষকে ধবংস করতে পারে। অ াদিম মানুষ পশুশক্তিকে বশে এনেছিল , আর সভ্য মানুষ পশুকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছিল, তাকে তার বন্ধু হিসাবে নিয়েছিল। তার ফলেই আমরা পেয়েছি অজস্র পশু-প্রতীক।

প্রতীকের জগতে আরেকটি বিশিষ্ট প্রতীক আছে, যা পৃথকভাবে আলোচনার যোগ্য। তা হল--- wheel symbol বা symbol of circle। আমরা জানি যে বৃত্ত বা গোলক প্রকৃতপক্ষের আত্মার (self) প্রতীক। এই সত্তা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নির্ধারণ করে। বৃত্ত প্রতীক হিসাবে আদিমকালের সূর্যবন্দনার কিংবা আধুনিক ধর্মে বা পৌরাণিক ব্যাখ্যায় পেয়ে থাকি বিভিন্নভাবে। এমনকি গোলক সংত্রান্ত তত্ত্ব যা প্রাচীন জ্যোতিষীরা উল্লেখ করেছেন, ত া জীবনের এক বিশেষ সত্তাকেই নির্দেশ করে। তা হল সম্পূর্ণতা বা 'ultimate wholeness'। ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বে দেখা যায়, ব্রহ্মা একটি বিরাট সহস্রদল পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখ চারদিকে নির্দিষ্ট, এই চতুর্মুখ অবস্থ াকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে সংযোগ করলে একটি বৃত্ত উদ্ভুত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে পদ্মের বৃত্ত থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এ হল প্রাথমিক সংজ্ঞা এবং দেবতা এখান থেকেই তার সৃষ্টির কাজ শু করেছেন। একই ধরনের কাহিনি দেখা যায় বুদ্ধের জীবনে। তাঁর জন্মমুহূর্তে একটি পদ্মফুল মাটি থেকে উঠে আসে এবং তিনি এর ওপর দিয়ে শূন্যে দশটি দিকে অবলে াকন করলেন। এই প্রতীকের ব্যাখ্যা হল সংক্ষিপ্তভাবে বুদ্ধের জন্মমুহূর্তকে দেখানো। বুদ্ধ যে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রকৃতপক্ষে নিজেকে আলোকিত করবেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তার অস্তিত্বকে এই সামগ্রিক প্রতীকীর মধ্যে দেখানো হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম সংত্রান্ত অনেক চিত্রে ও ভাস্কর্যে এর ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতের দৃশ্যকলা শিল্পে, এমনকি দূর প্রাচ্যে অষ্টপীড়ন সম্পন্ন বৃত্ত, প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় মূর্তির প্যাটার্ন হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে এবং তা অবশ্যই ধ্যান ও নিমগ্ন হবার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তিববতীয় লামাবাদের 'মন্ডল' এক অন্যতম

গুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। সেদিক থেকে 'মন্ডল' প্রকৃতপক্ষে Cosmos বা বিশ্বের প্রতীক, যা দৈব্যশক্তির
ই সমরূপ। এমনকি তিববতীয় লামাদের শহরে ভূমি পরিকল্পনা এই 'মন্ডল' --এর কথা মনে করায়। বাংলার আলপনা শিল্পেও এই Cosmos -এর ব্যবহার দেখা যায়। কিছু কিছু উৎসবে শুভ কামনার প্রতীক হিসাবে গোলাকার আলপনা দেওয়া হয়। এমনকি এই আলপনা শু হয় বিন্দুকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বিন্দু থেকেই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি, আর আলপনার বৃত্তটি ওই বিন্দুরই বৃহৎ রূপ। এছাড়া 'পৃথিবী ব্রত ' নামক ব্রতকথায় বা 'লক্ষ্মীব্রত'তে একটি গোলের মধ্য জাগতিক কিছু বস্তু বা রূপকে ধরার চেষ্টা দেখা গেছে। অর্থাৎ গোলাকার অংশটি পৃথিবীর সমগ্রতার একটি প্রতীক মাত্র। প্রাচীন ধ্যান ও যোগে মূর্তিকে সম্পূর্ণরূপে জ্যামিতিক হিসাবে নির্ণয় করা হয়। এগুলিকে বলা হয়Yantraeroticবা যন্ত্র। বৃত্তকে বাদ দিলে সাধারণ যন্ত্র মোটিফ তৈরি করা হয় দুটি পরস্পর অন্তর্ঘাতের মধ্যে অবস্থিত কোণে
র মাধ্যমে---একটা কোণ উপরের দিকে, অপরটা নিচের দিকে । সনাতন ভাবে এই আকৃতিটি প্রকৃতপক্ষে শিব ও শক্তির মিলনের প্রতীক। পুষ ও স্ত্রী দেবীর এই অবস্থা ভাস্কর্যে বিভিন্নরকম রূপ দেখা যায়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই বিশেষ ভাব দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির মিলন--- ব্যক্তির মিলনের সঙ্গে অব্যক্তির মিলন অর্থাৎ বাস্তবের তথা আত্মার বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে অনন্ত অনাত্মার মিলন --- যা সর্বধর্মের মূল লক্ষ্য --- কৌণিক যন্ত্র ও শিবশক্তির মিলনের ভাস্কর্যরূপ প্রকৃতপক্ষে বিরোধী শক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তাকেই নির্দেশ করে। এখানে তারা উল্লেখযোগ্যভাবে যৌনমূলক বা erotic। বিমূর্ত বৃত্ত জেন চিত্রকলায় দেখা যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। একটি বৃত্তের চিত্র এখানে enlightenmentএর প্রতীক। অর্থাৎ মানুষের পরিপূর্ণতার প্রতীক। এই বৃত্তটি প্রসিদ্ধ জাপানি জেন পুরোহিত সাংগা ই - এর দ্বারা চিত্রিত।

বিমূর্ত বৃত্ত ইউরোপীয় খ্রিস্টান শিল্পেও দেখা যায়। বেশ কিছু খ্রিস্টিয় গির্জার জানালার উপর বিমূর্ত বৃত্তটি গোলাপ ফুল হিসাবে অবস্থান করে ।এগুলি আসলে মানুষের আত্মার প্রতীক যা cosmic -এ রূপান্তরিত হয়েছে। অন্যদিকে মন্ডলকে আবার যিশুর মাথার পিছনেHalo বা চত্র হিসাবে ধরা হয়। বেশির ভাগ ধর্মীয় চিত্রে এই চত্র দেখা যায়। অনেক সময়ে যিশুর মাথার পিছনে চত্রটি চার ভাগে বিভত্ত অবস্থায় দেখা যায়, যা ত্রশের উপর মৃত্যুর ও সেই সঙ্গে ভগবানের সন্তান হিসাবে মানুষের দুঃখ বহন --- এই ধারণার প্রতীক। অখ্রিস্টিয় শিল্পে এই গোলককে সূর্যের প্রতিরূপ বলে মনে করা হয়। এ ধরনের গোলক নিওলিথিক সময়ে পাহাড়েও খোদাই করে রাখা হত। আবার, একটি বিরল ভার্জিন মেরির চিত্রে দেখা যায়, একটি গোলাকৃতি গাছ, যা এখানে জ্বলন্ত জঙ্গলের প্রতীক। তবে খ্রিস্টিয় শিল্পে মন্ডলের ব্যবহার হয়েছে যেখানে যিশু পরিবৃত হয়ে আছেন চারজন ভগবৎ প্রেরিত প্রচারক দ্বারা। এই ধরনের উদাহরণ আবার প্রাচীন মিশরীয় চিত্রে দেখা যায়, ভগবান হোরাস ও তার চারটে পুত্রের চিত্রে। রেনেসাঁ আগমনের ফলে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ফলে পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হয়। যুক্তির জয়গানকে স্বীকারের মাধ্যমে এসময়ে শিল্প বাস্তবসম্মত ও ইন্দ্রিয় পরায়ন হয়ে উঠল। এসময়ে গথিক আর্ট পূর্বে যা ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে নতুন যুগের পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে সংযুত্ত করল। গথিক শিল্প অনুযায়ী বিরাট উচচতার গির্জাগুলির পরিবর্তে গোলাকৃতি ভূমি পরিকল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। এবং গোলক খ্রিস্টানিটিতে স্বীকৃত হল। রেনেসাঁর ফলে শিল্পে দর্শনে বিজ্ঞানে যে বিপুল পরিবর্তন এসেছিল, সেখানে কিন্তু খ্রিস্টিয় কেন্দ্রীয় symbolটি অপরিবর্তিত থাকল।
এই দুই জাতীয় প্রধান প্রতীক ছাড়াও আমরা আরও কিছু ছড়িয়ে থাকা প্রতীক পাব, যেগুলি বিশেষ কোনও সভ্যতার শিল্পে বিশেষ অর্থকে বহন করে। যেমন প্রথমেই ধরা যাক মিশরের কথা। মিশরে Predynastic Ý Protodynastic যুগে ফ্যারাওদের ক্ষমতাকে দেখানো হত ষাঁড় -এর দ্বারা। ফিনিক্স ফ্যারাওদের রাজকীয় ও শক্তির প্রতীক। তবে মিশরীয় চিত্রে সব থেকে গুত্বপূর্ণ প্রতীক হল 'Solar disk' এবং তা অনেক সময়েই ডানাযুত্ত, যা সূর্যের প্রতীক।
আখেনাটেন -এর রাজত্বকালে এই 'Solar disk' -কে রশ্মিযুত্ত দেখা যায়, মানুষের হাতের আকারে। এই হাত হল আশীর্বাদের প্রতীক। মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় প্রতীককে ব্যবহার করা হয়েছে চূড়ান্ত ভাবে শুধুমাত্র দৈবশত্তিকে উপস্থাপনা করায়। এদের জাতীয় দেবতা 'আসুর' কে একটি ডানাযুত্ত ডিস্কের সাহায্যে দেখানো হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে

একটা মানুষের উধর্বাংশ বেরিয়ে আসছে। কোনও কোনও সময়ে তীব্রভাবে ছুটে আসা তীরগুলি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে পারসীয়ান দেবতা আহুর মাজ্দাকে। Cosmological symbolগুলোর মধ্যে সূর্য দেবতা Shamsh কে সিংহের প্রতীকে দেখানো হয়েছে। নদীর দেবতা Apus এর প্রতীক হল একটি নদী দুটি মানুষের মস্তককে একই সঙ্গে সংবদ্ধ করে আছে। সমুদ্র দেবতা 'Ea' কে একটি ছাগলের মস্তকযুক্ত মৎস্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ সমস্ত প্রতীকগুলি মেসোপটেমিয়া থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সীল, রিলিফ খোদাই বা দেওয়াল চিত্র থেকে পাই ।

ইরাণী শিল্পে প্রতীককে শুধুমাত্র গভীর ধর্মীয় ঋিাসের জন্য করা হয়নি, বরং কিছুটা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগত বাস্তবের দিক থেকেও করা হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার সীলেতে আমরা কিছু তালগাছ পাই, যা জীবনের গাছের প্রতীক । এই গাছকে দেখানো হয়েছে দুটি কল্পরাজ্যের ডানাযুক্ত দানবের সাথে। অপর একটি সীলে দেখা যায়, একজন বীর, যার ডানাযুক্ত সিংহের ন্যায় দেহ ও শিং -যুক্ত, যে একটি মনস্টারের সঙ্গে যুদ্ধরত। এ সমস্ত কিছুতেই প্রতীকের ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। Early Christian পিরিয়ডের প্রতীকগুলি অনেকটা স্বাভাবিক বা natural ।এই পর্বের প্রতীকগুলিকে Ravenna -র কিছু মোজাইকে, ক্যাটাকম্ব বা স্যাত্রোফ্যাগাসগুলিতে দেখতে পাই। বলতে গেলে Early Christian art -এর স্পিরিটটাই ছিল সিম্বলিক বা প্রতীকী এবং তা allusive ।এসব প্রতীকগুলির মধ্যে পাওয়া যায় absolute simplicity ।তালগাছ হচ্ছে মৃত্যু বা যন্ত্রণার প্রতীক। নোঙর মোক্ষলাভের প্রতীক। ধর্মান্তরিতকরণের বিশুদ্ধতাতে জলের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরার জন্য প্রতীক হল মাছ, যা জলেরই প্রতীক। জাহাজ চার্চের প্রতীক, অমরত্বের প্রতীক হল ময়ূর। আঙুরের থোকা বা ভেড়াসমেত মেষপালক এই ব্যাখ্যা করে যে, মেষপালক যেমন তার ভেড়ার জন্য জীবনত্যাগ করতে পারে সেরকম যিশুও তাঁর ভক্তদের জন্য সেরূপ করতে পারেন। এই একই প্রতীকী তাৎপর্যকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে অনেক প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য ও।

মধ্যযুগীয় শিল্পে প্রতীক একটা বিশেষ গুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। মধ্যযুগীয় সভ্যতার প্রতীকী ও রূপকধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি দৃশ্যকলা ও স্থাপত্যকলায় নিজেদের স্থান নিয়ে নেয়। এমনকি মধ্যযুগের প্রথম পর্বের পুঁথিচিত্রগুলিও প্রতীকের দ্বৈতসত্তা নিয়ে বর্তমান --- এক হচ্ছেfigural form --এ, আর দ্বিতীয় হচ্ছে calligraphy -তে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক শতকে প্রতীকীবাদ আবার শিল্পকলায় প্রত্যাবর্তন করে নিজস্ব এক রূপ ও নতুন অর্থকে বহন করে, বিশেষ করে ফ্রান্সের চিত্রকলায়। এর অর্থবহ প্রভাব প্রতিফলিত হয় 'ফ্রেঞ্চ সিম্বলিস্ট স্কুল' --এর দৃশ্যকলায়, বিশেষ করে Odilon Redon--এর কাজে। তাঁর কাজে একটা সম্পূর্ণ রূপগত অভিব্যক্তি দেখা যায় প্রতীকের মধ্য দিয়ে; যা ভীষণভাবে সাবজেক্টিভ, পর্যবেক্ষণগত বাস্তব নয়। তবে আধুনিক চিত্রকলায় প্রতীকী তাৎপর্য প্রথম দেখা যায় Jean Mores (1856 – 1910) --এর কাজে। সেটাকে আরও দূর প্রসারিত করেন Albert Aurien -। ইমপ্রেশনিস্ট ও নিও- ইমপ্রেশনিস্টদের কাজকে প্রতীকীর পর্যায়ে ফেলা যায়। কারণ এদের কাজ বর্ণনামূলকের থেকেও বেশি সংকেতপূর্ণ। কিছু শিল্পী যেমন Gustane Morean, Puvis de Charannes, Edward Burne Jones, Arnold Bocklin ----এঁরা নিজেদেরকে সিম্বলিস্ট বা প্রতীকবাদী ভাবতেন। প্রতীকবাদের অধ্যায়ে যে শিল্পী ভীষণভাবে আগ্রহী হন, তিনি হলেন পল গঁগ্যা। ১৮৮৫ সালে তাঁর 'থিয়োরিজ আব মর্ডান ডিজাইন' নামক লেখায় এ সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের কথা জানা যায়। তাঁর 'ভিশান আফটার দ্যা সারমন' (১৮৮৮) ছবিটি একটি সিম্বলিস্ট ছবি। এখানে বাস্তবের সঙ্গে প্রতীককে তিনি মিশিয়েছেন। তাঁর প্রতীকবাদ যাবতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ 'আইকনগ্রাফি'; সরলীকৃত রূপের পরিমিতি ও বিশুদ্ধ রং - এর মাধ্যমে উন্মুক্ত হয়েছে। এই শিল্পীরই আরেকটি ছবি 'হোয়ার ডু উই কাম ফ্রম ? হোয়াট আর উই ? হোয়ার আর উই গোয়িং টু ?' -তে শিল্পী জীবনের ঘুর্ণায়মান আবর্তকে প্রতীকী ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। প্রতীক এখানে যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যম। আরেক আধুনিক শিল্পী Klimt -এর ছবিতে প্রতীকতা (সিম্বলিজম) ও রূপকের মধ্যে এক সেতুবন্ধন গড়ে উঠতে দেখা যায়। বরং সুরিয়ালিজম - এর তত্ত্বগত

ভিত্তিই হল প্রতীকতা, যা Max Ernst -এর কাজে যেখানে প্রতীকের প্রকৃত অন্তর্নিহিত অর্থটি সুস্পষ্ট, বিশেষ করে তাঁর ‘দ্য গ্রেট ফরেস্ট’ (১৯২৭) ‘ইনার অ্যাসপারাগস’ (১৯৩৫) ছবিগুলিতে। Chirico-র মেটাফিজিক্যাল পেন্টিংগুলি প্রতীক ও রূপকের মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে। ‘গুয়ের্নিকা’ থেকে শুরু করে ‘ওয়ার এ্যান্ড পিস ছবিগুলিতে পিকাসো আধুনিক শিল্পতত্ত্বকে প্রতীকী রূপের মাধ্যমে সুস্পষ্ট অথচ একটা ভ্রম তৈরি করেছেন। ভারতীয় চিত্রকলায় প্রতীক বেশির ভাগ সময়েই এসেছে Anthropomorphic রূপে। ভারতের প্রাচীন প্রতীক হিসাবে ধরা যায় লিঙ্গকে। যা প্রথমদিককার হরপ্পা সংস্কৃতিতেই পাওয়া গেছে। এটি দেবতাদের উৎকর্ষতার প্রতীক। এমনকি শিবের ভাবমূর্তিতে ত্রিনেত্র, ত্রিশূল, ডমরু, পোশাক, সাপ - এসবেরও প্রতীকী তাৎপর্য আছে। সাপ যেন আত্মাহুতি রশ্মি বিশেষ, ডম যেন যাদুজগতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। শিবের এই মুর্তি বহু প্রাচীন কাল থেকে আমরা বিভিন্ন ভাস্কর্য্য ও চিত্রে দেখে আসছি। ভারতীয় শাস্ত্রানুযায়ী কিছু প্রাণীকে কোনও বিশেষ দেবতা বা গ্রহের প্রতীক হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। যেমন হস্তী ইন্দ্র ও শনি গ্রহের প্রতীক, উট শুক্রগ্রহের প্রতীক, র‍্যাম বা ছাগল অগ্নিদেবতার প্রতীক ইত্যাদি। ভারতীয় শিল্পে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রতীক হল ‘পদচিহ্’। ‘বিষ্ণুপদ’কে এক পবিত্র প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। এর মানে হল ‘তিন পদক্ষেপ’ বা ‘থ্রি স্টেপ্স্’। ঋগবেদে এজন্য বিষ্ণুকে উল্লেখ করা হয়েছে ত্রিবিক্রম বলে। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মেও ‘পদচিহ্’ কে পুজো করা হয় এবং তা বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রতীক হিসাবে। এমনকি ‘হস্তচিহ্’কে ও যথেষ্ট প্রতীকী গুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত কিছু ভাস্কর্যে বিশেষ করে স্তূপগুলিতে বুদ্ধকে অনেক জায়গায় সাদা হস্তীর প্রতীকে দেখানো হয়েছে। কারণ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়া দেবী শ্বেতহস্তীর স্বপ্ন দেখেছিলেন । এছাড়াও বুদ্ধের আরও প্রতীক আমরা অমরাবতী, সাঁচি বা বুদ্ধগয়ার স্তূপগুলিতে পাই। যেমন ত্রিরত্ন, পবিত্র গাছ, ধর্মচক্র প্রভৃতি। জৈন আইকনগ্রাফিতে পাওয়া যায় ‘Eight Ampicions Symbols’, বিশেষ করে জৈন পুঁথিগুলিতে। এর মধ্যে আছে স্বস্তিকা ও, যা একজন জৈন সাধুর প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতের জাতীয় পতাকায় ব্যবহৃত চক্রটি হল জীবনচক্র। এই জীবনচক্র কেবলমাত্র বুদ্ধ বা তাঁর নির্বানস্থানকেই সূচিত করে না, বরং এটি ‘Samsara’ -র নবজাগরণের অন্তর্নিহিত রূপের প্রতীকও। এর ব্যবহার আমরা পাই অজন্তার ১৭নং গুহার কিছু ম্যুরালে বা ভিত্তিচিত্রে। পশ্চিমী চিন্তাধারায় এটি আবার ভাগ্যচক্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। ভারতীয় চিত্রকলায় রঙের একটা আলাদা প্রতীকী তাৎপর্য আছে। শিবের পাঁচ আবতারের সঙ্গে দিকনির্দেশ ও রঙের প্রতীক যুক্ত আছে। যেমন সরহত (পশ্চিম, সাদা), বামদেব (উত্তর, লাল), তৎপষ (পূর্ব, হলুদ), অঘোর (দক্ষিণ, কালো) ও ঈশান (মধ্য, স্বচ্ছ স্ফটিক)। জৈনধর্মে শিল্পশাস্ত্রে পাঁচটি বর্ণকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যথা হলুদ, লাল, নীল, খয়েরি ও কালো। এই রংগুলির নিজস্ব প্রতীকী ব্যবহার অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে পটচিত্রে বা পুঁথিচিত্রে। জৈনশিল্পে তীর্থঙ্করেরা কয়েকটি বর্ণে উপস্থিত হন --- সোনালী লাল, সাদা, সবুজ, নীল ও কালো রঙে। তান্ত্রিকদের দেবীরাও বিভিন্ন রঙে ও দিকের প্রতীকীতে আবির্ভূত হয়েছেন। যেমন অমিতাভ (পশ্চিম, লাল), অমোঘসিদ্ধি (উত্তর, সবুজ), ভৈরকানা (মধ্য, সাদা) অকসোভয়া (পূর্ব, নীল), রত্নসম্ভবা (দক্ষিণ , হলুদ) প্রভৃতি। চিনদেশে কসমোলজিক্যাল সিম্বলগুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতীক হল। ‘Pi’, এটি স্বর্গের, দিব্যশক্তির ও পরে রাজশক্তির প্রতীক। এখানকার আরেকটি প্রাচীন প্রতীক হল, একটি বৃত্তের মধ্যে দুটি অর্ধের বিপরীতমুখী অবস্থান। এগুলিকে বলা হয় ---- Yin ও Yang । এটি বিশ্বের দুটি বিপরীত শক্তির অর্থাৎ পুষ ও স্ত্রী শক্তির সংবদ্ধ রূপের প্রতীক। চিনের টুং হুয়াং গুহাচিত্রে অনেক জায়গায়ই সূর্যকে দেখানো হয়েছে ‘কাক’ - এর প্রতীকের মাধ্যমে। এবং চন্দ্রকে দেখানো হয়েছে খরগোস বা ব্যাঙ -এর দ্বারা । এছাড়াও সূর্য ও চন্দ্রকে দেখানো হয়েছে এইভাবে যে, একটি বর্গক্ষেত্রকে একটি কম্পাসবিদ্ধ করেছে। এইরকম প্রতীকী তাৎপর্য ‘তাওবাদ’-এর মিথ-এ দেখা যায়। চিনের লোকশিল্পেও প্রতীকের নিজস্ব স্থান আছে। প্রাণীজগৎ, পক্ষীজগৎ, উদ্ভিদ, ফুল -- এসবই অলংকরণের পাশাপাশি প্রতীকী উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। বরং কনফুসিয়বাদে কোনও প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায় না। জাপানি চিত্রকলায় আবার প্রতীকের ব্যাপক ব্যবহার চোখে পড়ে। প্রতীকী তাৎপর্যযুক্ত জ্যামিতিক অলংকরণ এই শিল্পে খুবই প্রচলিত, বিশেষ করে সূর্য ও চন্দ্রের মোটিফ। সূর্য ও চন্দ্রকে সমকেন্দ্রীয় বৃত্ত বা রশ্মিযুক্ত বৃত্ত, বৃত্তের ভেতরে ক্রশ দেওয়া প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। Zigzag হল আলোর বা সাপের প্রতীক । এস্কিমোরা আবার এই প্রতীক দ্বারা নদীকে বোঝায়।

প্রতীকের ধারাবাহিকতা বা ব্যাপ্তি এতই বিশাল যে তা এই ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লেখ করা খুবই কঠিন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকের ইঙ্গিত ও আবেদনও বদলেছে বারবার। প্রাচীন যুগে প্রতীক এসেছে ধর্ম ও যাদুবিশ্বাসে ভর করে। পরবর্তী কালে তা চিত্রকলায় একটা নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতীকে আবেদন হয়েছে একেবারেই অন্যভাবে। এখানে প্রতীক আর রূপকের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং বিভিন্ন শিল্পী তাঁর নিজের ছবিতে ছবির প্রতিটি উপাদানের যেমন রঙ, টেক্সচার, রেখা, আলাদা আলাদা করে প্রতীকী তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশিষ্ট বিমূর্ত শিল্পী Mondrian, Kandinisky তাঁদের ছবিতে ব্যবহৃত প্রতিটি রঙের আলাদা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Mondrian বিশ্বের যাবতীয় বস্তুতে এমনকি মানবীয় অবয়বকেও শুধুমাত্র কিছু হরাইজন্টাল ও ভার্টিক্যাল black grids দিয়ে প্রকাশ করেছেন। প্রতীককে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমেরিকান দার্শনিক চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স প্রতীককে সবচেয়ে জটিল যোগাযোগ পদ্ধতি হিসেবে ব্যাখ্যা করে এক 'arbitrary sign' বলে আখ্যা দিয়েছেন। আবার সুইস ভাষাবিদ স্যোসুর প্রতীককে বলেছেন 'প্রিডিটারমিন্ড সাইন'। Cassirer -এর মতকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, আমাদের এই পৃথিবী বিষয়গত ও বস্তুগত উপাদানের একত্রিকরণ মাত্র এবং এসমস্ত কিছুরই ইগোর বিশ্লেষণ হল প্রতীক। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চিত্রকলায় প্রতীকায়ন গড়ে ওঠে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে, যেখানে 'স্পিরিট' (বা 'আত্মা') নিজেকে প্রকাশ করে ও সত্তার গভীরতাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে । ফলে ছবি হয়ে ওঠে কিছু প্রতীকের সম্মিলিত রূপ। যার জন্য চূড়ান্ত বিমূর্ত শিল্পী Mondrian ছবির অন্তর্নিহিত পরিকাঠামোই হল আধ্যত্মিকতা, যা প্রতীকী মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থাপিত।

তবে চিত্রকলা এখন আধুনিক পর্বকে পিছনে ফেলে উত্তর আধুনিক পর্বে উপস্থিত। এখানে শিল্পীদের স্বাধীনতা অনেকখানি। এখানে তাঁকে নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য কোনও প্রতীকী ব্যাখ্যায় যেতে হচ্ছে না। একটা চেয়ারকে বোঝাবার জন্য শিল্পী এক বাস্তবিক চেয়ারকেই গ্যালারিতে হাজির করতে পারে, তার জন্য তাঁর কোনও মাধ্যমের প্রয়োজন হচ্ছে না। অর্থাৎ বক্তব্য অনেক সরাসরি এখনকার শিল্পীদের। তাঁরা দর্শকদের অনেক সামনে হাজির, উভয়ের দূরত্বও কমে এসেছে। ফলে, এখনকার ছবিতে প্রতীকও আর কেবলমাত্র রূপকধর্মী বা মিথধর্মী নয়, বরং তা অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হিসাবে উপস্থাপিত। শিল্পীদের ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতা তখন ফুটে ওঠে এমন এক অনন্য প্রতীকধর্মীতায়, যা অতীতের নান্দনিক মাপকাঠিতে দোলা লাগে, নাড়া খায় সত্তা। জীবনানন্দের জগৎ - অনুভূতি যেমন আমাদের বোধের মধ্যে চারিয়ে যায়, তেমনি আজকের নবতর শিল্পীর সৃজনে প্রতীকের নব নব রূপ মনে হয় একান্ত আপনার।